আবৃত্তি ঃ কবিতার তৃতীয় ভুবন

অশোক পালিত

আবৃত্তি আদতে এক শিল্পনির্ভর শিল্প। অর্থাৎ ভাষাশিল্পের উপর ভর করে গড়ে ওঠা এক বাক্ শিল্প, কবিতা বা ছন্দিত গদ্য ভিত্তিক এক অনন্য প্রয়োগকলা; যাকে ইংরেজিতে বলা হয় পারফর্মিং আর্ট।

ভাষাশিল্পেরই এক রূপ কবিতা। কবিতা-রচনা এক সৃষ্টিকাজ। কবির অন্তঃস্থ অনতিক্রম্য এক অভিপ্রায়ের টানে শব্দময় শরীর হয়ে জন্ম নেয় কবিতা। কবির কল্পনা প্রতিভা, তাঁর রূপ নির্মাণের দক্ষতা ও তাগিদ আর হাজার হাজার শব্দবীজের অনন্ত সম্ভার-এই সবের এবং এই সঙ্গে আরও প্রাসঙ্গিক কিছুর সমবায়ে আশ্চর্য রসায়নে কবি সৃষ্টি করেন কবিতা। নিভৃতে একা। কবিতার সঙ্গে কবির এই জনন সম্পর্কই প্রথম, আদি। কবিই গড়ে তোলেন কবিতার প্রথম ভুবন।

জাত হবার পর সেই কবিতা খাতায় লেখা হয়, বইতে ছাপা হয়। পাঠক তাকে সংগ্রহ করেন, পড়েন। সে যেন ঘুমন্ত র াজকন্যা। সহৃদয় পাঠকের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় তার ঘুম ভাঙে, সাদা পাতার কালো অক্ষরের মধ্যে থেকেই সে অস্তিমান হয়ে পাঠকের নিজস্ব অনুষঙ্গে, অনুভবে, কল্পনায় আভায়। উপভোগের অন্যতর প্রক্রিয়ায় পাঠক নিজের মতো করে কবিতাটিকে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর চেতনায়। কবির অন্তঃপুর গিয়ে অন্যরূপে ভূমিষ্ঠ হল। আর এইভাবেই পাঠক তাঁর একা-র নিভৃত অন্তরীক্ষে গড়ে তোলেন কবিতার দ্বিতীয় ভুবন।

আবৃত্তিকারও প্রথমত একজন কবিতাপাঠক, দ্বিতীয়ত একজন কবিতাপাঠক শেষপর্যন্ত একজন কবিতাপাঠক। সুমনের ধরনে এইটাই বোঝাতে চাইছি যে আবৃত্তিকার আলগোছে কবিতা পাঠ করেন না। তাঁর আর কবিতার মধ্যে থাকে ‘কাঁঠ ালের আঠা এই অনুরাগ থেকেই তাঁর অভিজ্ঞান হয় যে, কবিতায় শব্দরা শুধু শব্দ হয়ে বসবাস করে না, করে যথেষ্ট স ম্পন্ন হয়ে--- কখনও নতুন অর্থের দ্যোতনায়, কখনও ক্যানভাসের মতো বুকে ছবি নিয়ে। শব্দের শিরায় শিরায় রক্তচল াচল তথা সুর-সঞ্চরণ তিনি টের পান। শব্দে শব্দে সংঘর্ষের ফুলকি অন্য ধবনির ইঙ্গিত দিয়ে যায় তাঁকে তার কাছে কবিত ার দৃশ্যমান আপাত অর্থময় অংশটুকু হিমবাহের দৃশ্য মান অংশের মতো। তিনি জানেন, শব্দের ফুলে সাজানো পঙ্ক্তি, পঙ্ক্তি মালায় সাজানো এক বা একাধিক স্তবক ---- এসবই কবিতার ভাব, কবিতার নিজস্ব অভিপ্রায় তথা তার প্রাণ, তার নিঃশব্দ জীবন। এই কবিতার জীবনের সঙ্গে তিনি তাঁর জীবন যোগ করেন।

এই জীবন মানে তাঁর প্রকাশিত হওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। একটা বিশেষ প্রয়োগকলার নিরন্তর চর্চার মধ্যদিয়ে উপ্ত বীজটি বাড়তে থাকে।

যথেষ্ট প্রস্তুতির পর যখন আবৃত্তিকার সেই কবিতা আবৃত্তি করেন, তখন তা পুনর্জাত হয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাধ্যমে অর্থাৎ যথাযথ ও ব্যঞ্জনাময় উচ্চারণের মারফত কবিতাটি চলে যায় শ্রোতাদের কাছে --- কাগজ থেকে নয়, আবৃত্তিকারের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়ে। কবিতাকে তার ভাষাশিল্পের সত্তা থেকে কণ্ঠে নিয়ে এসে তাকে বাক্শিল্পে পরিণত করেন আবৃত্তিক ার।

কবি অণ মিত্রের কথায়, “বৃহৎ জনসমষ্টির সামনে .... হিসেবে কবিতা পড়তে হলে তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা দরক ার। ...মূলত এই প্রস্তুতি, এই প্রশিক্ষণ, আনুষঙ্গিকের এই গুত্ব কবিতাপাঠের প্রকৃতি বদলে দেয়, কবিতা অবলম্বনে সৃষ্টি হয় এক বিশেষ শিল্পরূপ ..... (...........)-এর বৈশিষ্ট্যই তাই”।

এ কারণে গোড়াতেই বলেছিলাম, আবৃত্তি আদতে এক শিল্পনির্ভর শিল্প।

যাইহোক, ভালোবেসে কবিতাটিকে আত্মস্থ করা থেকেই শু হয়ে যায় আবৃত্তি করার প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি থেকে পরিণাম পর্যন্ত কোনও কবিতা আর কবির থাকে না, তা আবৃত্তিকারের চেতনায় অনুভবে তাঁর নিজস্ব হয়ে ওঠে। যাকে কবি শঙ্খ ঘে াষ বলেছেন, ‘আত্মপ্রাণিত অনুভব’।

আবৃত্তিকারের কাজ এই ‘আত্মপ্রাণিত অনুভব’-কে সহৃদয় শ্রোতাদের কাছে প্রকাশ করা। কী করে? প্রয়োগকলার একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে।

তাঁর কাজ, শ্রোতাদের কাছে শ্রুতিগ্রাহ্য উপভোগ্য ধ্বনিময় এক শিল্পরূপের সৃষ্টি করা। এই নিরিখে তিনিও শিল্পী। কবিতার সঙ্গে আবৃত্তিকারের এই সম্পর্ক তৃতীয়। আর এইভাবেই তিনি গড়ে তোলেন কবিতার তৃতীয় ভুবন।

একই কবিতা, তাকে প্রথম সৃষ্টি করলেন কবি; কবিতা ভিতর থেকে বাইরে এল--- নীহারিকার থেকে গ্রহের সুঠামে। তারপর সে চরিতার্থ হওয়ার জন্য পাঠকের বোধে গেল। পেয়ে গেল বাসভূমি। আবৃত্তিকারের প্রকাশের তাড়নায় আবার তাকে বাইরে আসতে হল। অবশ্যই অন্যরূপে।

এই রূপ সৃষ্টিটাই শিল্প। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, আবৃত্তিকারের আবার প্রকাশের তাড়না কীসের? কবিরা তাড়িত হয়ে সৃষ্টি করেন কবিতা, একটা নির্মাণকে নিজের মধ্যে থেকে মোচন করেন। ঠিক কথা। কিন্তু আবৃত্তিকার কী প্রকাশ করেন? তাঁর তাড়নাটাই বা কীসের আর তাঁর নির্মাণের ধরনটাই বা কীরকম?

উত্তর দেওয়ার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত বলে মনে হয়।

সেটা হল, এই যে আমি বলে এসেছি, প্রস্তুতি থেকে পরিণাম পর্যন্ত কোন কবিতা আর কবির থাকে না, তা আবৃত্তিকারের চেতনায় অনুভবে তাঁর নিজস্ব হয়ে ওঠে, তার মানে এই নয় যে কবির ভূমিকা আমি অগ্রাহ্য করছি। আবৃত্তি তো আর অমূলত কিছু নয়, তার মূল তো কবিতা।

এ প্রসঙ্গে কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় যা বলেন, তা তো সত্য, তাতে দ্বিমত হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। তিনি বলেছেন, “কবিতার আবৃত্তি মূলত কবিতারই সহযোগী শিল্প... কবিতার আবৃত্তি অন্যনিরপেক্ষ বা প্রায়নিরপেক্ষ বা স্বাধীন শিল্প নয়। ... আবৃত্তি অবশ্যই কবিতানির্ভর।”

এ কথা তো লেখার শুতেই আমি বলেছি। কবি কৃষ্ণা বসুর একটি লেখায় দেখছি, তিনি লিখেছেন,

“আবৃত্তি একটি শিল্প তো বটেই, কবিতার ক্ষেত্রে একটি জরি পরিপূরক শিল্পও তা, ...” এই লেখার অন্যত্র তিনি বলছেন, “আসুন, কবিতা এবং আবৃত্তিশিল্প এ দু’টিকে পরিপূরক, অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কযুক্ত শিল্প হিসেবে আমরা ভাবতে আরম্ভ করি।...”

আমাদের নতুন করে ভাবার দরকার নেই, আমরা তো জানিই, বিশ্বাস করি।

তবু যে বলেছিলাম “নিজস্ব হয়ে যায়,”; তার কারণ, মানুষ প্রকাশ করতে চায়, তার নিজের মধ্য থেকেই কিছু সৃষ্টি করতে চায়। আবৃত্তি যেহেতু আবৃত্তিকারের নিজস্ব শিল্প, সেক্ষেত্রে কবির কবিতাটা তখন ওই শিল্পের অর্থাৎ প্রয়োগশিল্পের উপাদান হিসেবে কাজ করে। ওই কবিতা তাকে এমনভাবে উদ্‌বুদ্ধ করে, এমন প্রাণিত করে যে, কবিতা তখন ‘আত্মতা’অর্জন করে, আবৃত্তিকারের নিজের হয়ে যায়।

কৃষ্ণা বসু যা বলেছেন তা শুধু সঠিক নয়, তার মধ্যে আরও গুত্বপূর্ণ কিছুর ইঙ্গিতও দিয়েছেন, ওই অংশে --- যেখানে আছে, “কবিতার ক্ষেত্রে একটি জরি পরিপূরক শিল্প...”

কেন বললেন, পরিপূরক? সুধী পাঠক, চিন্তা কন।

হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল, আবৃত্তিকারের প্রকাশটা কী।

একটু আগে যে বলেছি, কবিতার নিঃশব্দ জীবনের সঙ্গে আবৃত্তিকার তাঁর জীবন যোগ করেন, অর্থাৎ তাঁর প্রকাশ বাসনাকে, এটা বুঝতে পারলেই আবৃত্তিকারের প্রকাশের স্বরূপটা তখন সহজেই বোধগম্য হবে।

উত্তরটা আমি দু’টি স্তরে উপস্থাপনা করছি-প্রথম আবৃত্তিকার উৎপল কুন্ডুল একটা লেখা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করছি।

“যে রক্ত-মাংসের মানুষ আপনশ্বাসবায়ু দিয়ে, আপন কণ্ঠস্বর দিয়ে আপন রক্তপ্রবাহের উত্তাপ দিয়ে, আপনার জিব-দাঁত-ঠোঁটের সঞ্চালন দিয়ে প্রস্তুত করছে আবৃত্তি নামক শিল্পটা, সেই শিল্পের যেটা আত্মা, সেটাও তারই ভিতরে লালিত, তারই জীবনবোধ থেকে উৎসারিত হতে হবে। সেটা কারও কাছে ধার করা যায় না।...”

“তাই আবৃত্তি, কারোরই আবৃত্ত, কবি-মানসিকতার ফোটো-কপি হতে পারে না।...”

দ্বিতীয় --- আমার একটা লেখা (যা আগে এক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল) থেকে খানিক উদ্বার করছি।

কবির আত্মপ্রকাশ কবিতা রচনায়। প্রথমে বিন্দুর মতো আলো জ্বলে, তারপর ধীরে ধীরে পর্দায় ফেড-ইন। শব্দ, শব্দগুলো, পঙ্‌ক্তি, যেন দেখতে পাওয়া যায়, যেমন দেখতে পাওয়া যায় জলের ভিতর চঞ্চল মাছকে। শব্দ মুখ বাড়ায়, নীরবতা ভেঙে

যায়, কখনও নীরবতা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। কবি বলে ওঠেন,

'মনের মতো ভাষ্য খুঁজি। শব্দ দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড়। বুকের মধ্যে রক্ত ঝরে। তাইতে।'

একটি কবিতা যখন আবৃত্তিকারকে উদ্‌বুদ্ধ করে আবৃত্তি গড়ার জন্য প্রাণিত করে, তখন তিনি কবিতাটি বারবার পড়েনন; কবিতার রাজপথ থেকে অলিগলি, সদর-অন্দর সব তন্নতন্ন করে তলাশ করেন, খোঁজেন এক নির্মাণের উপকরণ সমূহ। কেমন করে উচ্চারিত হবে এর শব্দাবলি,শ্বাসপ্রশ্বাসকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করে পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তির গতি আর বিরতিকে স্পষ্ট, অথচ ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি দিয়ে প্রকাশ করতে হবে কবিতায়, নিহত নাটকের বা নাটকহীনতার উদ্ভাসটাই বা কেমন করে হবে, কবিতার ভাব, ছন্দ আর ছবিকেই বা কীভাবে মূর্ত করতে হবে এই নিয়েই আবৃত্তিকারের ভাবনাচিন্তার ক্ষরণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রয়োগশিল্পের মাধ্যমে তিনিও একটা রূপ নির্মাণ করতে চান। তিনিও চান নিজেকে মোচন করতে। অ াবৃত্তিকারের আত্মপ্রকাশ ---- ওই কবিতাকে অবলম্বন করে এক শৈল্পিক দক্ষতার প্রকাশ। এ হল নিজের হয়ে ওঠা ভাষা শিল্পের এক রূপকে অন্য এক প্রয়োগমাধ্যমে শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনি-রূপে রূপবান করে তোলা। রূপের সৃষ্টিই তো শিল্প। এই ফলিত শিল্পের মাধ্যমেই আবৃত্তিকারের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

অন্যভাবেও বলা যায় যে, আবৃত্তিকার ছবি আকেঁন। কোন্ ক্যানভাসে? যে ক্যানভাস চোখে দেখা যায় না, শুধু কানে শে ানা যায়, তেমন পটে তিনি ছবি আঁকেন। ছবির বিষয় কী? ওই কবিতা। আঁকার যাবতীয় কৃতি, রং-রেখার ব্যবহার, স্পেসকে ভরাট করা না করা-র ব্যবহার, ইত্যাদি আবৃত্তিকারের। তাঁর অনুভবের, তাঁর শিল্পবিষয়ক চেতনার, তাঁর চিন্তন-মননের, তাঁর কণ্ঠস্বর তথা উচ্চারণের যথোচিত প্রয়োগের, উপভোগ্য করে তোলার ক্ষমতার। অপরাধ যেন কেউ না নেন, আরেকভাবে বলছি---আবৃত্তি যেন কবিতার চরিত্রাভিনয়।

অথবা, কবিতা নিজেই যেন একটি নাট্যকল্প, যার বয়ন অর্ন্তনাট্য দিয়ে। শব্দে শব্দে চরিত্ররা অভিপ্রায় নিয়ে যেন মৌন, পঙ্‌ক্তি থেকে পঙ্‌ক্তিতে যেন দৃশ্যান্তর। এই নাটকের অভিনয় করতে হয় একা আবৃত্তিকারকে। অবশ্যই তথাকথিত নাটকের অভিনয়ের করণ-কৌশল দিয়ে নয়।

কেননা, মঞ্চশিল্প হলেও এদের প্রয়োগ-কলা-ভিন্ন রবীন্দ্রনাথ খুব সহজেই দু'য়ের ভিন্নতা পরিষ্কার করে বলে গেছেন--- "আবৃত্তি আর অভিনয় দু'টো স্বতন্ত্র শিল্প--- কিন্তু দেখেছি, অনেকেই দু'টোকে অভিন্ন মনে করেন। তাই গলা কাঁপিয়ে এংব হাত পা নেড়ে আস্ফালন করাকে তাঁরা চালিয়ে দেন আবৃত্তি ব'লে। আবৃত্তি বাচন শিল্প --- অভিনয় আনুষ্ঠানিক শিল্প, অ াকারে সহমর্মিতা থাকলেও তাই প্রকান্ডপ্রকারভেদ রয়েছে দুটোর মধ্যে।"

আবৃত্তির করণ-কৌশল এই কারণেও স্বতন্ত্র যে আবৃত্তিকারকে পুরো কবিতাটি অনুভবে জারিত করতে হয়, তারপর সেই সমগ্রকে একা একাই ফুটিয়ে তুলতে হয়। অভিনেতা যেখানে নাটকের একটি চরিত্রের সংলাপ বলেন, আবৃত্তিকারকে সেক্ষেত্রে অনেক শব্দের অভিপ্রায়কে ফুটিয়ে তুলতে হয়, এমনকী, কবিতার মধ্যে উত্তম পুষ ছাড়াও যদি কোনও চরিত্র থ াকে, তাকে বা তার সংলাপকেও। এই জন্যই বলছিলাম, আবৃত্তিকার কবিতার চরিত্রাভিনেতা।

এখন, আবৃত্তিকারকে এই যে সৃজনের কাজটি করতে হয়, একবারেই করতে হয়। তার মানে? মানে, পাঠক তো ইচ্ছে করলেই একটি কবিতা বারবার পড়তে পারেন, এক-আধটা লাইনের কাছে ফিরে ফিরেই আসতে পারেন; কিন্তু আবৃত্তিক ার সেই কবিতাই যখন আবৃত্তি করবেন, তাঁকে ওই একবারই করতে হবে, একেকটি শব্দ বা লাইন ফিরে ফিরে শোনাতে প ারবেন না। অনেকটা অভিনেতাদের মতো, তাঁদের নির্দিষ্ট সংলাপ কিন্তু একবারই বলতে হয়। গানের লাইনকে গায়ক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাইতে পারেন।

অতএব, আবৃত্তিকারের কাজটি কী কঠিন! সীমিত সময়ের মধ্যেই আগ্রহী বা উদাসীন, সমঝদার বা অরসিক শ্রোতাদের জন্য একবার, মাত্র একটিবার আবৃত্তি করেই কবিতাবিশেষের ধ্বনিরূপ সৃষ্টি করতে হয়, শুধু তাই নয়, যতদুর সাধ্য ত াদের ভালো লাগাতে হয়। এরজন্যই তাঁকে পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হয় নিবিড়ভাবে। অনুশীলনকে গভীর করে তুলতে হয়। এ জিনিস কবিতার প্রতি পরম মমতা ছাড়া হয় না। শুধু মমতায় হয় না; বোধ, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা আর অনুভবকে ধারালো করে তুলতে হয়। তারপর তো তাঁর বাক্‌যন্ত্রটির সাধনা রয়েছেই। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ক্ষমতার মতো সর্বঅনুভূতি প্রক াশক্ষম উচ্চারণশৈলীকে নিপুণ আর যথাযথ করে তুলতে হয়। তাঁকেও এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যেতে হয়।

আসলে, একটি দ্বন্দ্বের মীমাংসার নাম আবৃত্তি। এ দ্বন্দ্ব কবির সঙ্গে আবৃত্তিকারের নয়। এ আবৃত্তিকারের নিজস্ব এক

অন্তদ্বর্ন্দ্ব। তাঁর চেতনার এক মুখে থাকে কবিতা আর অন্য মুখে সেই কবিতাকে ব্যঞ্জনা-ঋদ্ধ উচচারণে ধবনিরূপ দেওয়ার বা শ্রোতাদের শ্রুতির শূন্য ক্যানভাসে শব্দের ছবি আঁকার তীব্র বাসনা। শব্দরাজীর স্থির দৃশ্যরূপ একদিকে সাদা পাতায় কালো অক্ষরে, অন্যদিকে সেই স্থিরকে চঞ্চল জায়মান করার প্রবল ইচছা। এ দু'য়ের সংঘাতভূমিতে দাঁড়িয়ে আবৃত্তিকার। তাঁকেই এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে হয়।

এর জন্য, অর্থাৎ এই অভিপ্রায়কে বাস্তবে ত্রিয়াসিদ্ধ করার জন্য চাই কবিতা সংত্রান্ত সমৃদ্ধ অনুভব আর আবৃত্তি নামক ধনুর্বিদ্যিটির নিবিড় জ্ঞান ও তার নিরন্তর প্রয়োগচর্চা। এইটাই দ্বন্দ্বের মধুর নির্জন স্বরূপ।

মধুর---কেননা, ভালোবাসা নিহিত আবেগে ভরা থাকে এর কঠিন সাধনকাল। আর নির্জন--- কেননা, সাধনা তো নিভৃতেই করতে হয়।

এই সাধনপর্ব শেষ হলে তখন যিনি বেরিয়ে আসেন তিনি-ই অর্জুন।

তার মানে, জানতে হয় মাটির কোন্ গভীরে আছে সুপেয় জলের সঞ্চয়। সেই সঙ্গে আয়ত্ত ক রতে হয়, মাটির সেই সঠিক বিন্দুতে তিরবিদ্ধ করবার চমৎকার কৌশল। এর যথাযথ প্রয়োগ ঘটলে তবেই তো তাঁর পিপাসা মিটবে।

এ তথ্য জানতেন অর্জুন আর তাঁর আয়ত্তে ছিল এবং বিধ কুশলতা, তাই তৃষ্ণার্তকে জলদানের পুণ্য তিনিই অর্জন করেছিলেন।

এই অতিরিত্ত মাত্রা যুত্ত হল কী করে তাঁর শিক্ষায়? তাঁর সাফল্যে? এ হল তাঁর প্রতিভা। শুধু তত্ত্বজ্ঞান আর অনুশীলনের অতীত একটা কিছু। আবৃত্তিকারদের মধ্যে যাঁর এই প্রতিভা থাকে তিনি অর্জুন।

তিনি পারেন নতুন মাত্রা যোজনা করতে। কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তো বলেইছেন, "অবশ্য আবৃত্তিকার যদি কণ্ঠস্বরের স্বকীয় বিভঙ্গ বা ....-এর সাহায্যে মূল কবিতা থেকেই স্বতঃই উৎসারিত অথচ অজ্ঞাতপূর্ব কোনও সম্ভবপর ও বিশ্বাসযোগ্য নতুন ব্যাখ্যা দেন তবে তা অবশ্যই গ্রাহ্য, কেননা তার ফলে কবিতাটিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে।"

'ব্যাখ্যা' শব্দটিকে আমি 'তাৎপর্য' হিসেবে গ্রহণ করেছি। যাইহোক এমন কথা কবি কৃষ্ণা বসু-ও বলেছেন, "অনেক আবৃত্তিশিল্পী কবিতাটিকে যথার্থ বাজান, এবং তাঁদের কণ্ঠে উচচারিত হয়ে কবিতাটির ভিতরে যে লুকানো ঐর্য ছিলো তা দীপ্তি পেয়ে একেবারে উজ্জ্বল হয়েই ওঠে।"

তিনি আরও বলেছেন, "এমন ঘটনাও তো ঘটে, অনেকবার পড়া এবং চেনা কবিতা আবৃত্তিশিল্পীর অপরূপ কণ্ঠে গভীরতর, নবীনতর ব্যঞ্জনা পেয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে..."

এহেন আবৃত্তিশিল্পীকেই আমি অর্জুন বলছি।

হয়তো কেউ প্রা তুলবেন, এই যে প্রতিভাবান আর ধরা যাক দাণভাবে সফল আবৃত্তিশিল্পীরা সাধারণত আবৃত্তির জন্য কী ধরনের কবিতা নির্বাচন করেন? করেন সেইসব কবিতা যার মধ্যে আছে উচচকিত নাটকীয়তা, আবেগকে তোলপাড় করার মতো কাব্য পরিস্থিতি, মজিয়ে দেবার মতো রগড়, চটকদার ব্যঙ্গ, সাম্প্রতিক কোনও প্রবণতার প্রতি সামাজিক এষ (যা শ্রোতাদেরও মনের কথা) ছন্দের চাতুর্য, এমনকী রাজনৈতিক বাষ্পে ভরপুর গরম ভাষণ। এইসব না-কবিতা, প্রায়-কবিতা অপকবিতা আর প্রতিকবিতা (?) দিয়েই তো বাজিমাত করেন এঁরা? তাই নয় কি?

এর উত্তর দেওয়ার আগে আমরা যদি নিজেদের দিকে একটু তাকাই, তাহলে দেখব--- ওই প্রশ্ন বিদ্ধ হওয়ার মতো অবস্থা আমরাই তৈরি করেছি। অর্থাৎ ওই ধরনের কবিতা বা অপকবিতা যাই হোক না কেন আমরা যে একদম বলি না, তা নয়। কিন্তু সকলেই বলি না, এবং সব অনুষ্ঠানেও বলি না। আমরা জানি এই ধরনের কবিতা (কবিতাই বলি, কেননা কবিরাই তো এগুলো লেখেন) ভালো করে আবৃত্তি করতে পারলে শ্রোতারা অভিভুত হন, হাততালি দেন। আমাদের যশ হয়, নানাদিক থেকে ফুলেফেঁপে উঠি।

"কিন্তু আবৃত্তিকারেরা তো অন্যধরনের কবিতাও বলেন। কবি শিবশম্ভু পাল তাঁর এক লেখায় বলেছেন,

"কিন্তু অন্যতর কবিতাও আছে যা শব্দের আড়াল থেকে উৎসারিত করে ধ্যানস্তব্ধ সান্দ্র নৈঃশব্দ্য, চিত্রকল্প আর প্রতীকের ভেতর থেকে মেলে দেয় বিপন্ন বিস্ময়ের আমন্ত্রণ। এখানে নাটক নেই, হাতে-গরম সমকালীন প্রসঙ্গের অম্লমধুর ঝাঁঅঝ নেই। তার বদলে আছে কিছু প্রাপ্রখর সন্দেহকুটিল রত্তপাতের মতো আত্মবিদারক স্বগতোত্তি। আবৃত্তিকার এসব কবিতায় সচরাচর হাত বাড়ান না। তাঁর কণ্ঠের মতো তিনি নিজেও কম হিসেবি নন।"

শব্দযোজনার অসামান্য প্রয়োগে শিবশম্ভু যেসব কবিতার স্বভাবকে এইভাবে চিহ্নিত করলেন সেরকম কবিতা আবৃত্তিকাররা মাঝে মাঝে যে আবৃত্তি করেন না, তা নয়। করেন তাঁর আসরের ধরন বুঝে; শ্রোতাদের মর্জি বা চাহিদা আন্দাজ করে; আগে পরে কোন্ কোন্ আবৃত্তিকার অনুষ্ঠান করেছেন বা করবেন, কে কেমন বাহবা পেয়েছেন বা কে কেমন পাবেন ইত্যাদি বিবেচনা করে। সত্যি কথা বলতে কী, তূণের থেকে এইসব তির বার করবার আগে আমাদের সাত-পাঁচ ভাবতে হয়। আবৃত্তির আসর হলে না প্যান্ডেলে, ঘরোয়া না বারোয়ারি, শ্রোতারাই বা কেমন ---এই সব ভাবনা। সত্যি, আমরা হিসেবি।

শ্রোতারা যদি দীক্ষিত পাঠকের মতো হন, যাঁদের সম্পর্কে শিবশম্ভু বলেছেন, "সে না লিখেও অনেকখানিই কবি, অন্তত সংবেদনরা দিক থেকে, কাব্যবোধের দিক থেকে। এবং এই সংবেদ ও কাব্যবোধ কিছুটা অন্তর্জাত, কিছুটা অনুশীলিত"। তাহলে আমরা অগ্নিপরীক্ষা দিতে রাজি আছি। তাহলে আমরা ওই ধরনের কবিতাও আবৃত্তি করব।

কিন্তু শ্রোতা কারা? তাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগ এক একটা অনুষ্ঠানে কত মিনিটের? (আমি আবৃত্তির মেগাস্টারদের এখানে ধরছি না) এবং সে যোগ একেবারে সরাসরি, প্রত্যক্ষ। আবৃত্তি তো মৌহূর্তিক শিল্প।

স্বল্প সময়ের মধ্যে আবৃত্তিকার মনের আনন্দে শিবশম্ভু পাল যে ধরনের কবিতায় কথা ইঙ্গিত করেছেন, সেই রকম কবিতা বলে এলেন, শ্রোতাদের তা মাথার বা বুকের (?) বা ঘাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেল, কোনও সাড়াই জাগাল না, এটা ভাবলেই বোধহয় আমরা সিঁটিয়ে যাই।

আমাদের এই কষ্টের কথা কবিরা কি জানেন?

বাংলাভাষী বিশাল জনসমাজে আবৃত্তি এখনও সেইভাবে পৌঁছায়নি, যেমন বা যতটা বাংলা গান পৌঁছেছে। আবৃত্তি তো এখনো তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উপভোগের শিল্প।

হাতে গোনা দু-একজন আবৃত্তিশিল্পী ছাড়া ক-জন আবৃত্তিকারের ক্যাসেট বের হয়? সেখানেও তো আবার বিক্রির সমস্যা আছে। গ্রামোফোন কোম্পানি বা এই ধরনের বড়ো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আনুকুল্য ক-জন পায়?

ফলে উপভোগের পরিসর যেমন সীমিত, তেমনি শ্রোতাসমাজের কাব্যচিও এখনও অপরিণত। এই অবস্থায় আমরা এমন সব কবিতা বলে বাহবা কুড়োই যা অনেক কবির বা দীক্ষিত শ্রোতার পছন্দ নয়। ঠিক কথা, তবে এটাই সম্পূর্ণ মানচিত্র নয়। এমন কিছু উৎসর্গীকৃত আবৃত্তিকার আছেন, যাঁরা তাঁদের নির্বাচনে ওই ধরনের কবিতা রাখেন, এবং শ্রোতাদের নন্দিত করে দেন। সে ক্ষমতা তাঁদের আছে। আমি যেসব অসুবিধে প্রতিকুলতার কথা বলেছি, তাঁরা এসবকে ছেঁদো অজুহাত বলে মনে করেন, আসলে, আমি এই ব্যতিক্রমীদের কথা বলছি না, একটা সাধারণ প্রবণতার স্কেচ তৈরি করছি।

রবীন্দ্রযুগের অব্যবহিত পরেই আমরা এমন একটা 'আধুনিক কবিতার যুগে'র সন্ধান পেলাম, যেখানে কবিতায় আবেগ কম; ব্যক্তিগত অনুভবের অনুষঙ্গে মননের প্রয়োগে কবিতা উচ্চকিত ভাব পরিহার করে মৃদুভাষ আর সেই সঙ্গে জটিল হয়ে উঠল। মিলের ব্যবহার কমে গেল, গদ্যস্পন্দ জাঁকিয়ে বসল, শ্রুতিমুখর মনোরম কাব্যিক শব্দের বদলে অন্যধরনের চরিত্রবান শব্দরা দল বেঁধে এসে গেল আমাদের বিমূঢ় করে। কবিরা যেন নিজেদেরই কবিতা শোনাচ্ছেন,স্বগতোক্তি। এধরনের একান্ত ব্যক্তিগত কবিতাকে আবৃত্তিকার হিসেবে আমরা হয়তো আত্মস্থ করে নিতে পারি না। এই ধরনের কবিতা আবৃতি করতে হয়তো তেমন উদ্‌বুদ্ধ হই না। হয়তো ভারি, শ্রোতারা এসব বুঝবেন না। হয়তো এ কারণেও আমারে নির্বাচনে ওই ধরনের কবিতা থাকে না।

চল্লিশের কবিতা ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক হয়ে উঠল অর্থাৎ দেশের সর্বসাধারণের মনের মাটিতে শিকড় নামাতে চাইল, সর্বজনীন আবেগের প্রতিনিধি হয়ে উঠল--- নানা ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সামাজিক কারণে।

এ ধরনের কবিতা আবৃত্তিকাররা বলে থাকেন, এবং এই ধারায় লেখা পরবর্তী ষাট-সত্তর দশকের কবিতাও আবৃত্তিকাররা কারণে।

কেননা, তাঁরা মনে করেন, এটা তাঁদের একটা সামাজিক দায়। কবিতাকে ব্যক্তিগত বৃত্তবাঁধন থেকে বৃহত্তর সামাজিক স্তরে উত্তীর্ণ করে দিচ্ছেন কবিরা, ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সামাজিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাত্ম করে দিচ্ছেন, আমরা, যারা মনে করছি ---- আবৃত্তি করাটার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতাও থাকে, তারা এইসব কবিতা সত্যিই উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আবৃত্তি করি। লক্ষ করেছি শ্রোতারাও এসব কবিতার আবৃত্তিতে আলোড়িত হন।

এহেন পরিস্থিতিতে আবৃত্তিকার কী করবেন।

এবার ধরা যাক, ওই ‘তথাকথিত ব্যক্তিগত’ ধারার সাম্প্রতিক কবিতার কথা।

“এই আধুনিক বাংলা কবিতা চলেছে নেতি, নেতি-র মন্ত্র আওড়িয়ে, না-ছন্দ, না-মিলের জমকালো যমক, না-কবিতার চরণের কান-আদর-করা মিঠে সুললিত শব্দবন্ধ, না-অলংকার বাহুল্য--কিছু না। কেননা, এসব, এসব কিছুই ‘এহ বাহ্য’। এসব, কবিতার পোশাক পরিচ্ছদ আর ভূষণমাত্র, আসল কবিতা এ নয়। ... ব্যঞ্জনাই কবিত্ব। ব্যঞ্জনা অর্থাৎ বাচ্যার্থের থেকে ভিন্ন, অন্যতর দ্যোতনা। বলার অধিক ও বলার অতীত না-বলা কথা। শব্দের, ভাষার, ইঙ্গিতময়তা, সংকেত-বহন অর্থাৎ, কবিতায় স্পষ্ট করে যা বলছি, ঠিক তা কিন্তু বলতে চাইছি না, আরও নতুন কিছু, আরও অন্য কিছু আমার উদ্দিষ্ট।...

এ কবিতা যতখানি কানে-শোনার ও শুনে যতখানি উপভোগ করার, ততখানিই কিংবা তার চেয়েও বেশি চোখ-দিয়ে পড়ার, নিবিষ্ট অভিনিবেশের এবং উপলব্ধির।” -----(কবিতা ও কবিতার কথকতা মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

ইচ্ছে করেই এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম, কেননা, এরফলে বোঝা সহজ হয়ে যায় ইদানিংকার অধিকাংশ কবিতা নিবিষ্ট হয়ে পাঠ করা, নিভৃতে আস্বাদন করার একার অন্তরীক্ষে উপভোগ করার। এ ধরনের কবিতাকে হলে প্যান্ডেলে কবিতার মিশ্র ভীড়ে, মঞ্চ ও দর্শকাসনে আলো-অন্ধকারময় পরিবেশে, মর্জির আন্দাজ-পাওয়া শক্ত। এমন শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপনার জৌলুসের মধ্যে কি নিয়ে যাওয়া সংগত?

যদি সংগত হয়, তাহলে ধরে নিতেই হবে, কেউ উত্তীর্ণ হবেন, কেউবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কবিতার আবেদনকে জখম করে ফেলবেন।

এই যে-ধরনের কবিতার কথা আমরা আবৃত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করছি, যে-ধরনের কবিতা অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়, তার মধ্যেও অনেক কবিতার সন্ধার পাওয়া যায় যা বেশ আবৃত্তিযোগ্য, শুধুই নিরালায় পড়বার নয়। এটা আবৃত্তিকারেরাই প্রমাণ করে দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন। ফলে, শ্রোতারাও তৈরি হয়ে উঠেছেন। এ ধরনের কবিতা আবৃত্তি করা, এ ধরনের কবিতার সংঘাত দিয়ে তাঁদের মধ্যে নতুন নতুন অভিভব সৃষ্টি করাটাও একটা সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক দায় বলেই গ্রহণ করতে হবে আবৃত্তিকারদের।

না হলে কিন্তু আবৃত্তি ক্রমশ ‘পপ আবৃত্তি’ হয়ে উঠবে। যার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যেমনটা অন্য ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। নাচ-গান ইত্যাদির ক্ষেত্রে। হয়তো এ জলতরঙ্গ রোধ করা যাবে না, কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না।

যদি জিজ্ঞেস করেন, ‘পপ আবৃত্তি’, --- সে আবার কী? তাহলে বলব, তাকে আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। আভাস পেয়েছি মাত্র। ভালোভাবে দেখতে পেলে অবশ্যই বলব। তবে, ‘পপ আবৃত্তি’ শুধু ‘পপ কবিতা’ (?)-র উপরে নির্ভর করে না। মানুষকে মত্ত করতে তাতে আরও কিছুর মিশেল দিতে হয়। সুতরাং কবি আর আবৃত্তিকার, আপনারা স্থির করে নিন--- কে কী করবেন।

কৃতজ্ঞতা; সাংস্কৃতিক খবর